শহীদ কমরেড তাজুল

'এই দেশে এক সোনার টুকরো ছেলে ছিল/ লেখাপড়া শিখে তবু আদমজীতে কল ঘোরাতো।' সেই সোনার টুকরো ছেলেটিই কমরেড তাজুল ইসলাম। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও শ্রমিকের চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন দেশের সর্ববৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান আদমজীতে। লক্ষ্য একটাই — বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দিক থেকে বহুকাল ধরে পিছিয়ে থাকা আদমজীর শ্রমিকদের শোষণমুক্তির লড়াই-এ সংগঠিত করা। তার এই দীর্ঘ বিপ্লবী প্রয়াস যখন সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছিলো একটু একটু করে, ঠিক তখনই শাসক-শোষক শ্রেণীর গূঢ় ও নির্মম ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন তিনি।

শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার আদায় ও ৫-দফার ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেয়ার সংগ্রামে আদমজীর এই তরুণ কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতা ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ সামরিক সরকারের দালাল সাদু-রবের গুণ্ডাদের হাতে নিহত হন।

কমরেড তাজুল ইসলামের জন্ম মন্বন্তরের বছর, বাংলা ১৩৫০ সনে। কুমিল্লা জেলার মতলব থানার ইছাখালি গ্রামে। তার পিতা মিয়া মোহাম্মদ আব্দুল করিম ছিলেন সাধারণ কৃষক। পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতো সংকটাপন্ন ছিল যে কিশোর তাজুল চাচাতো ভাই হারুনসহ গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় এসে গৃহভৃত্যের কাজ, আইসক্রিম বিক্রি করে জীবিকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পড়ার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। তাই দেশে ফিরে গিয়ে মামার অভিভাবকত্বে বছর তিনেক মাদ্রাসায় পড়ার পর আবার স্কুলে পড়া

শুরু করেন মেধাবী তাজুল। ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান লাভের মধ্যদিয়েই তাঁর মেধার প্রাথমিক স্ফুরণের আভাস পাওয়া যায়। বৃত্তির টাকা ছাড়াও স্কুলে নিজ ক্লাসেরই তিনজন ছাত্রকে প্রাইভেট পড়িয়ে উপার্জিত টাকায় তিনি নিজ খরচের পাশাপাশি আপন ও চাচাতো ছোট ২/৩ ভাইকে পড়ার জন্য অর্থসাহায্য করতেন। ৭ম শ্রেণীতে থাকতেই তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করে। ১৯৬৬ সালে মতলব হাইস্কুল থেকে তিনটি লেটারসহ এসএসসি পাশ করার পর রাজধানীতে এসে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে।

এই সময় তাজুলের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর বিয়ে। শ্বশুর বদরপুরের খোরশেদ আলম শিকদার, গ্রামের বিত্তশালী। উচ্চমাধ্যমিকে তাজুলের ইচ্ছেমতো বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি না হয়ে আর্টসে ভর্তি হবার পেছনে শ্বশুরের এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে মেধাবী জামাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে বড় আমলা হবে। কিন্তু আড়ালে সংঘটিত মহান গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক আয়োজন প্রস্তুতির আবহাওয়ায় মামুলি আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে তাজুলের জীবনের ভিন্ন পথরেখা অঙ্কিত হচ্ছিল তখন। শুধু নিজেকে, নিজের পরিবারকে ঘিরে ভাবা সাধারণ আত্মস্বার্থচিন্তা তাজুলের তরুণ মনকে আকৃষ্ট করেনি তাই।

১৯৬৮ সালে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাজুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হন। থাকতেন সলিমুল্লাহ হলে। ঐ ছাত্রাবাসে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসেবে তিনি পাকিস্তানি স্বৈরশাসনবিরোধী ছাত্র-গণআন্দোলনে স্বীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনগণের শোষণমুক্তির সংগ্রামে আত্মনিয়োগের শপথ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেও তাজুলের বিলম্ব হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কাজে তাজুল সীমান্তের ওপারে আগরতলার বরদোয়ালি ক্যাম্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

তাজুল আদমজীতে যান ১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে। এর আগে তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রচার সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

তাজুল অর্থনীতিতে এমএ পরীক্ষা দেন ১৯৭৩ সালে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর সাবসিডিয়ারি অসম্পূর্ণ থাকায় অনার্স ও এমএ দুটো পরীক্ষারই ফলাফল স্থগিত থাকে।

আদমজীতে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ ছিল তাজুলের মতো একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণের পক্ষে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তাজুল স্বেচ্ছায় এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত তিন বছর তিনি বাইরে থেকে আদমজী শিল্পাঞ্চলে যাতায়াত করে সংগঠনের কাজ করতেন। পরে আদমজীতে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি একজন সাধারণ বদলি শ্রমিক হিসেবে মিলে কাজ নেন। পরে তিনি অফিসে স্টাফের কাজ করতেন, কিন্তু বেতন পেতেন একজন শ্রমিকের।

শহীদ তাজুল ছিলেন 'আদমজী মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের' নেতা, — আনুষ্ঠানিকভাবে এর সহসভাপতি, কিন্তু মূল নেতা। জাতীয় ফেডারেশন 'পাটকল ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের' আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন; তবে শেষ পর্যন্ত আদমজীনগরই ছিল তাঁর মূল রণক্ষেত্র। আদমজীতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একটি শাখার তিনি সম্পাদক ছিলেন। সেখানে তিনি 'একতা'-ও বিক্রি করতেন।

তাজুলের জীবন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর নয়। তা ছিল ব্রতীর জীবন। তাঁর ব্রত ছিল বিপ্লব। অর্থকষ্ট, নিজে রান্না করে খাওয়া, শ্রান্তিহীন কাজ সবই তিনি হাসিমুখে মেনে নিতেন।

আদমজীনগরের পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের দ্রুত ও সহজ বিস্তার লাভের আশা কেউ-ই করতেন না। মাঝে-মধ্যে কমরেডদের মনে সংশয়ও দেখা দিত। কিন্তু তীব্র প্রতিকূলতার মুখেও তাজুল প্রতিবারই তাঁর বিপ্লবী প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। এর সুফলও পেতে শুরু করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। তাজুলের মৃত্যুর ছয়-সাত মাস আগে থেকে সংগঠন বিস্তারের একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। মিল ও আশেপাশের অন্তত অর্ধলক্ষ মানুষ তাজুলকে এক নামে চিনতো। সে সময় তাজুল নিজেই বলতেন, মনে হচ্ছে এখন পায়ে মাটি পাচ্ছি। এমনই এক পরিস্থিতিতে দেশের ১১টি শ্রমিক ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ৬৫০ টাকা নিম্নতম মজুরিসহ ৫ দফা দাবিতে এবং দেশে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে ১৫-দল, ৭-দলের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৫-দফা রাজনৈতিক গণদাবির সমর্থনে '৮৪-র ১ মার্চ সকল শিল্পকারখানায় ধর্মঘট আহ্বান করেছিল। নিজস্ব শ্রেণীগত ও জাতীয় রাজনৈতিক দাবিতে এই তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন সফল করার জন্য দেশের সর্বত্র কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মীরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন।

আদমজীতে ১ মার্চের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রশাসন, সাদু ও রবের অশুভ আঁতাত তৈরি হয়। তারা ঠিক করেছিল ভয় দেখিয়ে সি-শিফটের শ্রমিকদের ভোরেও আটকে রেখে 'মিল চালু' দেখানো হবে। কিন্তু ২৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় যখন হরতালের সমর্থনে খণ্ড খণ্ড মিছিল শুরু হয় এবং ধর্মঘট করানোর জন্য ১১-ফেডারেশনের কৌশল হিসেবে রাত ১০টার পরে ঐক্যবদ্ধ মিছিলটি মিল প্রদক্ষিণ করতে পারলে সকালের অপেক্ষা না করেই ওই শিফট থেকেই ধর্মঘট নিশ্চিত — এটা জানতে পেরেই সাদু-রব তাদের গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়। তারা ভেবেছিলো তাজুলকে নিরস্ত করতে পারলেই ধর্মঘট ব্যর্থ হবে। কিন্তু ওদের হিসেবে ভুল ছিল। তাজুলের মৃত্যুবার্তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো মিলের এক শেড থেকে আরেক শেডে ছড়িয়ে পড়ে ধর্মঘট ও প্রতিরোধের পতাকা হয়ে। ১ মার্চ রাতে তৃতীয় শিফট পর্যন্তও এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। কমিউনিস্ট তাজুল জীবন দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ রক্ষা করেন। ❑